পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
PKSF

GREEN CLIMATE FUND

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি)

সভার আলোচনা সহায়িকা

Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)

অধ্যায় ১ - ফ্লিপ চার্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী

১. অংশগ্রহণকারীদের সামনে ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন করার পূর্বে সভা পরিচালনাকারীকে অবশ্যই এর নির্ধারিত বিষয়বস্তুগুলো ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের সামনে ফ্লিপচার্টের লেখা দেখে পড়া সমীচীন নয়।

২. ফ্লিপ চার্টটি এমনভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী তা দেখতে পারেন।

৩. উপস্থাপনার সময় ফ্লিপ চার্টের কোন অংশ যাতে কোন কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে।

৪. সাধারণত ফ্লিপ চার্টের এক পার্শ্বে ছবি এবং অন্য পার্শ্বে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে, প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিন এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে দলের সভা পরিচালনা করুন -

- ছবিতে আমরা কী দেখছি?
- সেটা দেখে কী বুঝছি?
- আমাদের চারপাশে কি এরকম ঘটনা ঘটে?
- এসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কী করি?
- এসব ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কী করা উচিত?

৫. সভা পরিচালনাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে একে একে আলোচ্য বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দেবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন, সভা পরিচালনাকারী কৌশলে তাদের আলোচনায় নিয়ে আসবেন।

৬. যদি মাটিতে বা মেঝেতে বসে ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হয় তাহলে ফ্লিপ চার্টটি অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি বরাবর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ফ্লিপ চার্টের এক পাশে ছবির ওপর আলোচনা শেষ না করে অন্য পাশে যাওয়া উচিত হবে না।

৮. ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনভাবেই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হবে।

৯. ফ্লিপ চার্ট এর শিখণবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য সভা পরিচালনাকারী প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন।

অধ্যায় ১ - ফ্লিপ চার্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী

অধ্যায় ২ - আরএইচএল (RHL) প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)

সংক্ষেপে: আরএইচএল (RHL) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের জন্য টেকসই ও বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(১) জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বাড়ি নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও বসতভিটা উঁচুকরণ।

(২) কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল কাঁকড়া চাষ।

(৩) মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন।

(৪) লবণাক্ততা সহনশীল সবজি চাষ (বাড়ির আঙিনায়)।

(৫) বসতবাড়ির আঙিনা ও স্থানীয় পর্যায়ে বৃক্ষরোপন।

প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থার নাম: গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: উপকূলীয় ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় মোট ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মেয়াদ: ৫ বছর (১৭ আগস্ট ২০২৩ - ১৬ আগস্ট ২০২৮)।

প্রকল্পের মোট বাজেট: ৫৫০ কোটি টাকা (৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার)।

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা: সরাসরি উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ৩,৬২,৪৭৫ জন।

অধ্যায় ২ - আরএইচএল (RHL) প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বাড়ি নির্মাণ

কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন

কাঁকড়া চাষ

বসতভিটায় সবজি চাষ

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

বৃক্ষরোপণ

অধ্যায় ৩ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি)

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি)/Climate-Change Adaptation Group (CCAG) কী?

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি) হলো প্রকল্পের সুবিধাভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত দল, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাধানের পথে অগ্রসর হবে। আরএইচএল (RHL) প্রকল্পের আওতায় ৭টি উপকূলীয় জেলায় ৩,২০০ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল রয়েছে, যেখানে রয়েছে ৮২,০০০ এর অধিক সদস্য। প্রকল্পের আওতায় এ সকল অভিযোজন দলসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল গঠন করা হয়?

- নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ২০ জনের সমন্বয়ে ১ টি করে দল গঠন করা হয়।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবারের সদস্য বাদ না পড়ে, প্রয়োজনে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- দল পরিচালনার জন্য সকল সদস্যদের সম্মতিতে ৩-৫ সদস্যের একটি কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল-এর কাজ কী?

- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যগণের অংশগ্রহণে প্রতি মাসে একবার সভা করা। সভায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, প্রভাব ও মোকাবেলা করা এবং স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি ও প্রস্তুতকৃত কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে দলের সদস্যদের সাথে নিবিড় আলোচনা করা।
- অভিযোজন দলের সদস্যগণের মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উপকারভোগীদের নির্বাচন করা ও উপযুক্ত কাজে তাদের নিযুক্ত করা।
- প্রতিটি দলের কমিটির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট গ্রামে প্রকল্পের আওতায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা।
- প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী (রেজ্যুলেশন) প্রস্তুত করা এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
- প্রতিটি দলের জন্য সাইনবোর্ড স্থাপন করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ঋণ কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে যুগপৎ কাজ করা।
- অভিযোগ গ্রহণ করা ও অভিযোগ নিষ্পতির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অধ্যায় ৩ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি)

অধ্যায় ৪ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রমে দলীয় সদস্য ও কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় সদস্যদের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত উপযুক্ততা বিবেচনা করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। নিচে অভিযোজন দলের সদস্যদের দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করা হলো:

নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ: অভিযোজন দলের সদস্যগণ নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবেন।

অভিযোজন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ: আলোচনার মাধ্যমে এবং সদস্যের মতামত নিয়ে স্থানীয় জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় অভিযোজন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবেন।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: স্থানীয় জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন: প্রকল্পের আওতায় সুবিধা প্রদানের জন্য উপকারভোগী নির্বাচন ও প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন।

সুবিধা বণ্টন বিষয়ে সিদ্ধান্ত: সদস্যরা কে কী ধরনের সুবিধা পাবেন, তা সবাই মিলে আলোচনা করে যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবেন।

সদস্যদের সমস্যা সমাধান: সদস্যদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে দলীয়ভাবে একযোগে চেষ্টা করবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের কমিটির (সভাপতি, সেক্রেটারি ও ক্যাশিয়ার) দায়িত্ব

সভাপতি

- দলের নিয়মিত সভা আহ্বান করবেন।
- সভার আলোচ্য বিষয় ও সময় নির্ধারণ করবেন।
- সেক্রেটারির সহযোগিতায় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করবেন।
- অভিযোজন দলকে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করবেন।
- সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করবেন।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।
- দুর্যোগকালীন সময়ে সদস্যসহ স্থানীয় জনগণের সহায়তায় নেতৃত্ব দেবেন।

সেক্রেটারি

- সভার আয়োজন ও সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
- সভার আলোচ্যসূচি প্রস্তুত করবেন এবং সভাপতি ও সদস্যদের তা জানাবেন।
- প্রকল্প কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সদস্যদের মাঝে পৌঁছে দেবেন।
- সভাপতি ও ক্যাশিয়ারের সহযোগিতায় সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন।

ক্যাশিয়ার

- দলের আর্থিক বিষয়সমূহ যেমন: সদস্যদের সঞ্চয়, অংশীদারিত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করবেন।
- সভার কার্যবিবরণীসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং হিসাব যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

অধ্যায় ৪ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যায় ৫ - পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

পরিবেশ

সাধারণভাবে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষ, গাছ-পালা, পশুপাখি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট ইত্যাদি সব কিছুই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ মূলত মাটি, পানি, বাতাস ও জীবমণ্ডল নিয়ে গঠিত।

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ বলতে পৃথিবী/ভূ-পৃষ্ঠের ভৌত এবং জৈবিক উপাদানসমূহের (যেমন- মাটি, পানি, বাতাস) এমন কলুষিত হওয়াকে বোঝায়, যা পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াসমূহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এবং যা জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর। এটি মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। দূষণের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন হয় তাই পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ

১. পানি দূষণ

- খাবার বা গৃহস্থালীর কাজের জন্য নির্দিষ্ট/সংরক্ষিত পুকুরের পানিতে গরু-ছাগল গোসল করানো, কাপড় ধোঁয়া ও মলমূত্র মিশ্রিত করা।
- ময়লা-আবর্জনা, গোবর, হাঁস-মুরগির খামারের বিষ্ঠা ইত্যাদি নদী, খাল, পুকুর বা অন্য যে কোন জলাশয়ের পানিতে অথবা এর আশেপাশে ফেললে পানি দূষিত হওয়ার আশংকা থাকে।
- কৃষি কাজে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, আগাছা নাশক ও কীটনাশকের ব্যবহার, যা বৃষ্টির পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে খাল, বিল বা পুকুরের পানির দূষণ ঘটায়।
- মাছ শিকারের জন্য নদী, খাল অথবা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করা।

৩. শব্দ দূষণ

- উচ্চ শব্দে হর্ণ বাজানো।
- কলকারখানার ও নির্মাণ কাজের ফলে সৃষ্ট উচ্চ শব্দ।
- মাইকিং বা উচ্চ শব্দযন্ত্র (Loud Speaker) ব্যবহার।

২. মাটি দূষণ

- ময়লা-আবর্জনা ও দূষিত রাসায়নিক পানি যত্রতত্র মাটিতে ফেলা।
- মাছ চাষ ও কৃষি কাজে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, আগাছা নাশক ও কীটনাশকের ব্যবহার।
- ব্যবহার শেষে পলিথিন ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র যত্রতত্রভাবে মাটিতে ফেলা।
- মাছ শিকারের জন্য নদী, খাল অথবা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করা।

৪. বায়ু দূষণ

- সনাতন পদ্ধতির চুলা ব্যবহার করে রান্না করা।
- গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগির খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করা।
- খোলা জায়গায় যত্রতত্র পায়খানা করা।
- ইট ভাটার নির্গত ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস।

অধ্যায় ৫ - পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

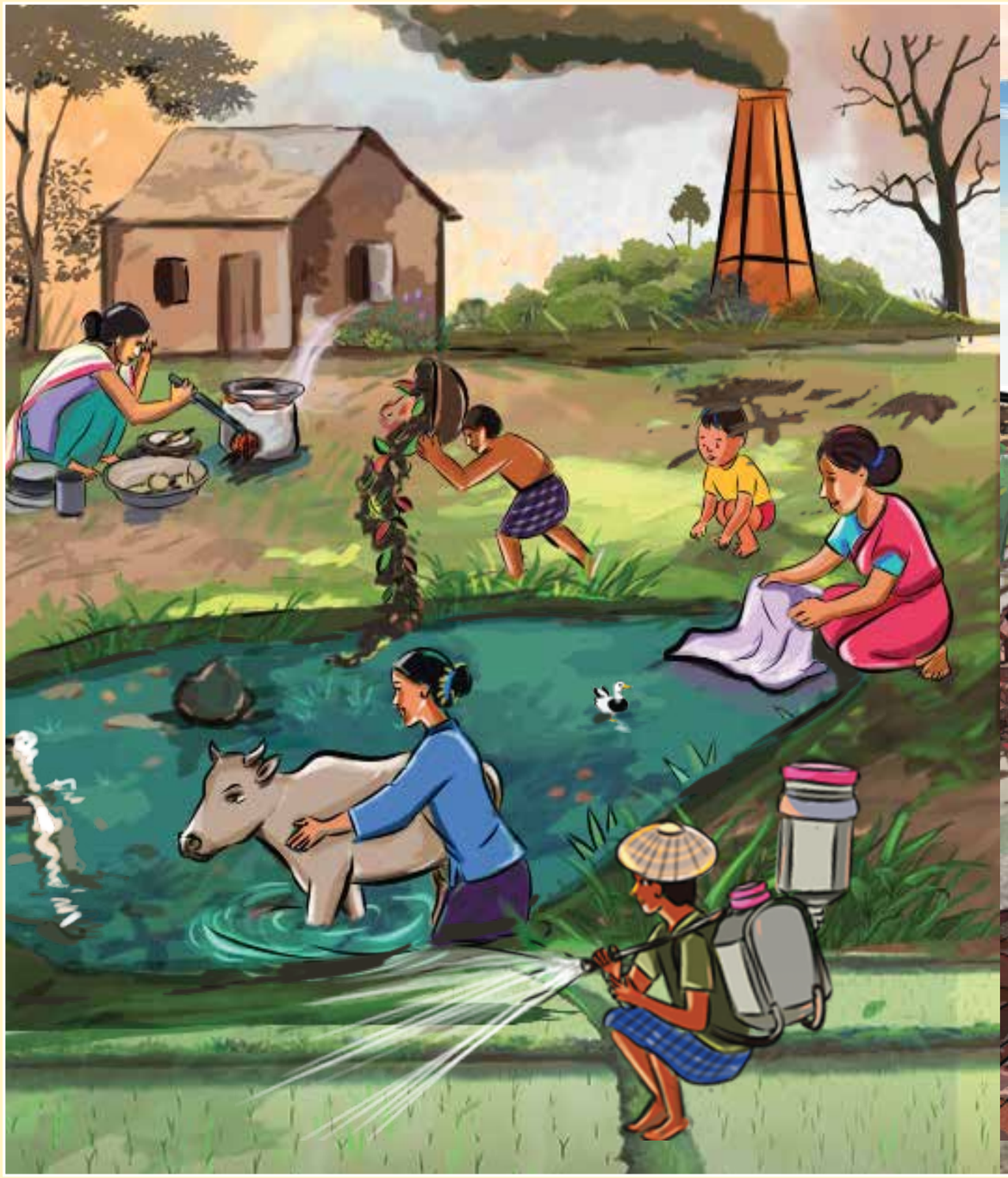

অধ্যায় ৬ - পরিবেশ দূষণের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়

পরিবেশ দূষণের প্রভাব

- বিশুদ্ধ পানি ও নির্মল অক্সিজেনযুক্ত বাতাসের অভাব হয়।
- মাটির গুণমান নষ্ট হয়ে ফসল উৎপাদন কমে যায়।
- বায়ু, পানি ও মাটি দূষিত হওয়ার কারণে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন রোগব্যাধি, যেমন - শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, ক্যান্সার ইত্যাদি বেশি দেখা দেয়।
- জীবজন্তু এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয় - জীবজন্তুর আবাসস্থল নষ্ট হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পায় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে।

পানি দূষণ রোধে করণীয়

- খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত পুকুরে অন্য কোনও কাজ করা যাবে না।
- প্রাণী গোসলের জন্য পুকুর ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যবহারযোগ্য পানির সাথে মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।
- নির্ধারিত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলতে হবে।
- কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।
- পলিথিন, প্লাস্টিক ও অপচনশীল দ্রব্য পানিতে ফেলা যাবে না, পুনঃব্যবহার করতে হবে, বা যারা পুনঃব্যবহার করে তাদের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বায়ু দূষণ রোধে করণীয়

- পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা ব্যবহার করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
- ময়লা আর্বজনা পুন:ব্যবহার করতে হবে।
- গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

মাটি দূষণ রোধে করণীয়

- পচনশীল বর্জ্য (গৃহস্থলীর ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি) যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- কৃষি জমিতে জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
- রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, আগাছা নাশক ও কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে জৈব বা বিকল্প পদ্ধতি (ফেরোমন ট্র্যাপ, আলোকবাতি, জৈব সার, পাখির আশ্রয় ব্যবস্থা, ভার্মি কম্পোস্ট ইত্যাদি) অনুসরণ করতে হবে।
- যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার প্রবণতা বন্ধ করতে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- উর্বর কৃষি জমিতে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা যাবে না।
- উর্বর কৃষি জমিতে মাছ, চিংড়ি কিংবা কাঁকড়া চাষের জন্য লবণাক্ত পানি প্রবেশ করানো যাবে না।

শব্দ দূষণ রোধে করণীয়

- যানবাহন চলাচলের সময় অপ্রয়োজনীয় হর্ণ বাজানো বন্ধ করতে হবে।
- জনবহুল এলাকায় নির্মাণ কাজ ও কলকারখানার শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকার আশেপাশে 'নীরব এলাকা' ঘোষণার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ৬ - পরিবেশ দূষণের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়

অধ্যায় ৭ - আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

আবহাওয়া: আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো নির্দষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের সামগ্রিক অবস্থা, যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর গতি, মেঘ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। আবহাওয়া প্রতিদিন অথবা প্রতি ঘণ্টায়ও পরিবর্তিত হতে পারে।

জলবায়ু: কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থাকে জলবায়ু বলে। এটি সাধারণত ৩০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুর গতি ইত্যাদির গড় ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান: আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বলতে সেই সকল মৌলিক উপাদানকে বোঝায় যেগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যদিও আবহাওয়া ও জলবায়ু দু'টি আলাদা বিষয়, তবে তাদের উপাদানসমূহ এক ও অভিন্ন। আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান উপাদানগুলো হলো:

- তাপমাত্রা - কোনো স্থানের গরম বা ঠান্ডা অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- বৃষ্টিপাত - বায়ুমণ্ডল থেকে পানির তরল বা কঠিন অবস্থায় (বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি) পতন।
- বায়ু প্রবাহ (বাতাসের গতি ও দিক) - বায়ু কীভাবে ও কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার গতি কেমন।
- বায়ুর আর্দ্রতা - বাতাসে পানির বাষ্পের পরিমাণ।

অধ্যায় ৭ - আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

অধ্যায় ৮ - জলবায়ু পরিবর্তন, কারণ ও প্রভাব

মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহের মৌলিক অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। কোনো অঞ্চলের গড় আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী (কমপক্ষে ৩০ বছর) ও স্থায়ী পরিবর্তনই হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এটি কয়েক দশক থেকে কয়েক শতাব্দী বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে এবং এর পেছনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট - উভয় কারণই দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণসমূহ

- **জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার:** কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানি পোড়ালে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইডসহ নানা গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।
- **প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপচয়:** খনিজ, জল ও অন্যান্য সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে।
- **বৃক্ষ নিধন ও বনাঞ্চল ধ্বংস:** গাছপালা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। বন কমে যাওয়ায় এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব

- **তাপমাত্রার চরম পরিবর্তন:** কোনো এলাকায় অতিরিক্ত গরম আবার কোথাও অস্বাভাবিক ঠান্ডা পড়তে পারে। খরা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি:** বরফ গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের পানি বাড়বে এবং নিচু এলাকা প্লাবিত হবে।
- **লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে:** উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বাড়ায় পানীয় জল ও কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- **পানির সংকট তৈরি হবে:** স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গিয়ে পানির উৎস শুকিয়ে যেতে পারে।
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে:** ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ও বজ্রপাতের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়বে।
- **কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটবে:** অতিরিক্ত বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি খাদ্য (ধান, গম, সবজি ইত্যাদি) উৎপাদন কমিয়ে কৃষিকে হুমকির মুখে ফেলবে।
- **মানব স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়বে:** হিট স্ট্রোক, পানিশূন্যতা, ত্বক ও শ্বাসজনিত রোগ বাড়বে।
- **জীববৈচিত্র্যের ওপর হুমকি:** অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি জলবায়ু পরিবর্তনে টিকে থাকতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

অধ্যায় ৮ - জলবায়ু পরিবর্তন, কারণ ও প্রভাব

অধ্যায় ৯ - অভিযোজন (Adaptation) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

অভিযোজন

অভিযোজন বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে মানুষ, সমাজ ও পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সহজভাবে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য গৃহীত বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি ও পদক্ষেপকেই অভিযোজন বলা হয়।

অভিযোজন কেন প্রয়োজন?

১. **খাদ্য ও সুপেয় পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** পরিবেশ বিপর্যয়ে খাদ্য উৎপাদন কমে যেতে পারে। অভিযোজনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন সঠিক মাত্রায় নিশ্চিত করা সম্ভব।

২. **কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখা:** খরা, বন্যা বা লবণাক্ততার মতো সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কৃষি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

৩. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সচল রাখা:** জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৪. **বাসস্থান ও জান-মালের নিরাপত্তা:** ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে প্রাণহানি, বাসস্থান ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়।

৫. **স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অভিযোজন একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকর কৌশল। এটি শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা সমাজ ও জাতিকে একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

অধ্যায় ৯ - অভিযোজন (Adaptation) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

অধ্যায় ১০ - অভিযোজনের বিভিন্ন উপায়সমূহ

বাসস্থান ও অবকাঠামোগত অভিযোজন

- উঁচু জমিতে দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ।
- বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় উঁচু বাঁধ, রাস্তাঘাট ও দুর্যোগ সহনশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ।
- দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র এবং নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- বসতভিটার চারপাশে গাছ লাগানো, যাতে মাটির ক্ষয় রোধ হয়।
- উপকূলীয় এলাকায় ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে উপকূলীয় বন সৃষ্টি।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় অভিযোজন

- লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা সহনশীল ধান, সবজি ও অন্যান্য ফসল চাষ।
- লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খরার উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমন: ধাপে বা বিটে চাষ)।
- ভাসমান বাগান বা মাচায় সবজি চাষ (যেমনঃ শাক, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি)।
- স্বল্পমেয়াদী, আগাম বা নাবী ফসল চাষ করা।

পানি ব্যবস্থাপনায় অভিযোজন

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সচেতনভাবে ব্যবহার।
- পুকুর খনন এবং খাল, পুকুর ও জলাধার সংস্কার ও সংরক্ষণ।
- পরিশোধিত পানির ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নলকূপ ও ল্যাট্রিনসহ অন্যান্য অবকাঠামো উঁচু জায়গায় স্থাপন করা।

জীবিকায় অভিযোজন

- মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগি, পালন যা অল্প জায়গায় সম্ভব এবং দুর্যোগ সহনশীল।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষ।
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (যেমনঃ হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি)।

জ্ঞান ও সচেতনতায় অভিযোজন

- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনা।
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের আয়োজন।
- নারী, শিশু, প্রবীণসহ সব শ্রেণীর মানুষকে অভিযোজন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- স্থানীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে অভিযোজন পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া।

জলবায়ু অভিযোজন কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা এই অভিযোজন প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলবে।

অধ্যায় ১০ - অভিযোজনের বিভিন্ন উপায়সমূহ

অধ্যায় ১১ - প্রশমন (Mitigation) এবং প্রশমণের প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ

প্রশমন (Mitigation): জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাস (যেমন: কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি) নিঃসরণ কমানোর জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে প্রশমন বলে। এটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের গতি ধীর করে এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকি কমায়। প্রশমন কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী রেখে যেতে পারি।

প্রশমন কেন প্রয়োজন?

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি, দুর্যোগ ও পরিবেশগত ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

প্রশমনের প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ

জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন

- পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা ব্যবহার।
- সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি।
- সেচ ও কৃষিকাজে সৌরশক্তি নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার।
- জীবাশ্ম জ্বালানি (কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল) ব্যবহার কমানো।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়

- ঘরবাড়ি ও অফিসে সিএফএল বা এলইডি বাতির ব্যবহার বাড়ানো।
- অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- সঠিকভাবে বর্জ্য পৃথক করা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- পচনশীল বর্জ্য ভালভাবে পচিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন।
- গোবর ও গোবর্জ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা।

বন ও কৃষিভিত্তিক প্রশমন

- বন ধ্বংস বন্ধ রাখা ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ।
- ধানের জমিতে AWD (Alternate Wetting and Drying) পদ্ধতিতে সেচ পরিচালনা।
- পরিবেশবান্ধব সার যেমন: গুটি ইউরিয়া, ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট সার ব্যবহার।

অধ্যায় ১১ - প্রশমন (Mitigation) এবং প্রশমণের প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ

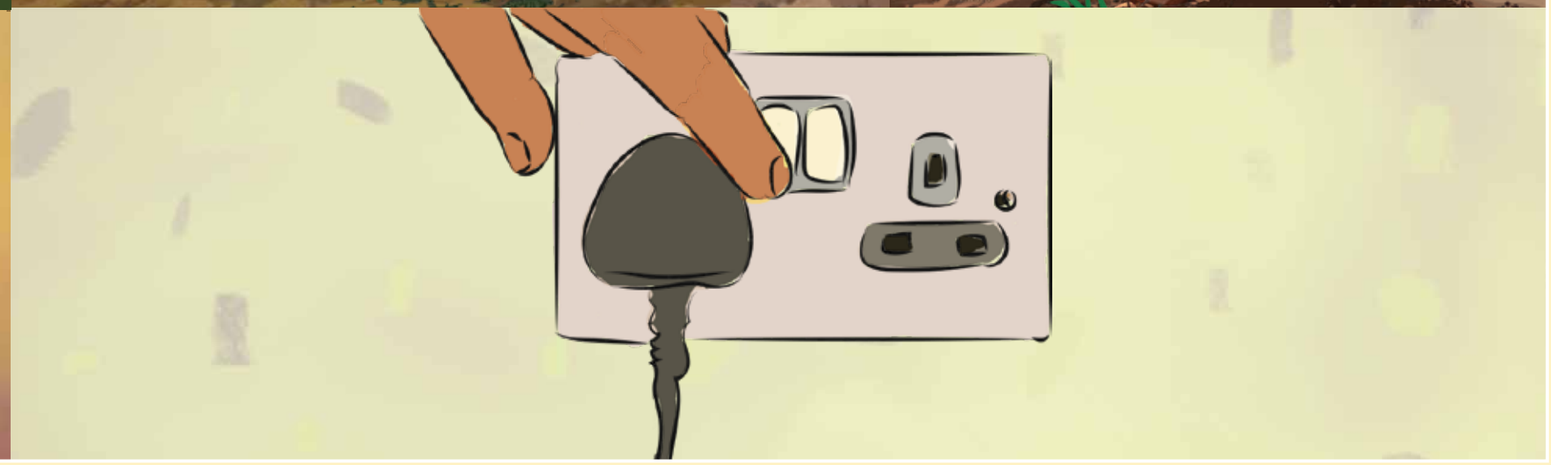

অধ্যায় ১২ - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বৃদ্ধি

ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন: যে ঝড়ে বাতাস, বৃষ্টি ও বজ্র প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলে তাকে ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন হলো সমুদ্রে সৃষ্ট বৃষ্টি, বজ্র ও প্রচণ্ড ঘূর্ণি বাতাস সংবলিত আবহাওয়ার একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া। এই ধরনের ঝড়ে বাতাস প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলে বলে এর নামকরণ হয়েছে ঘূর্ণিঝড়।

ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি: কোনো স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে উষ্ণ বায়ু ওপরে উঠতে থাকে। সমুদ্রের কোনো স্থানে বাতাসের চাপ কমে গেলে সেখানে লঘুচাপ তৈরি হয়। তখন আশেপাশের জলীয়বাষ্প পূর্ণ শীতল বাতাস ওই স্থানে চলে আসে। চারপাশ থেকে আসা বাতাসের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড়।

ঘূর্ণিঝড়ের সময় করণীয়

- বাতাস শান্ত হয়ে গেছে মনে হলেও ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। বাতাসের গতিবেগ পরবর্তীতে আবারও বাড়তে পারে এবং তা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ঘূর্ণিঝড় শেষ হয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণার আগে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন।
- গৃহপালিত প্রাণী ঝড়ের পূর্বে বাঁধন খুলে দিন।
- হাঁস-মুরগি ঘরের মধ্যে উচু স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- নির্দেশনা পেলে কয়েক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধদের উপযোগী খাবার ও ওষুধ সঙ্গে নিন এবং নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্দেশে দ্রুত রওনা দিন। সম্পত্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্দেশনা মেনে চলুন এবং আশ্রয়কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ না বলা পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রেই অবস্থান করুন।

ঘূর্ণিঝড় থেমে যাওয়ার পর করণীয়

- বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে তার ছড়িয়ে পড়লে তা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলুন;
- দ্রুত বাড়ির আঙিনা থেকে বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করুন;
- ঘরে ওঠার আগে ভেতরে সাপ বা পোকামাকড় আশ্রয় নিয়েছে কিনা নিশ্চিত হন;
- ঝড়ে ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানান।
- গৃহপালিত প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ করুন।
- ঝড়ের পরে নিজে ও গৃহপালিত প্রাণীদের সুপেয় পানি পান করান।

অধ্যায় ১২ - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বৃদ্ধি

অধ্যায় ১৩ - ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের সতর্ক সংকেত

সমুদ্রের জন্য সতর্ক সংকেত

সতর্ক সংকেত	সতর্ক সংকেতের ব্যাখ্যা	সংকেত (পতাকা)
১ নম্বর সতর্ক সংকেত	বন্দরের দূরে সর্বোচ্চ ৬১ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, যা ছোটখাটো ঝড়ের ইঙ্গিত - এ সময় সমুদ্রে চলাচলে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।	একটি লাল পতাকা
২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত	গভীর সমুদ্রে হয়তো তখন একটা ঝড় তৈরি হয়েছে, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬১-৮৮ কিলোমিটার। অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে মাঝারি তীব্রতর একটি ঝড় হচ্ছে।	একটি লাল পতাকা
৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত	ঝোড়ো হাওয়া উপকূল ও বন্দরেই বইছে, যার গতিবেগ ঘন্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার; সমুদ্র আরও উত্তাল, তাই নৌযান চলাচলে ঝুঁকি বেশি।	একটি লাল পতাকা
৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত	এটি ৩ নম্বরের চেয়ে আরেকটু শক্তিশালী এবং এই ঝড়ে বন্দরের জাহাজ ও নৌকা ইতিমধ্যে ঝড়ে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।	একটি লাল পতাকা
৫ নম্বর বিপদ সংকেত	ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগে মাঝারি ঝড় বন্দর এলাকা দিয়ে বয়ে যেতে পারে, যা সাধারণত বন্দরকে বাঁ দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করে।	দু'টি লাল পতাকা
৬ নম্বর বিপদ সংকেত	এই ঝড়ের গতিবেগ ৫ নম্বরের মতোই। তবে এটা বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল এলাকা ত্যাগ করে।	দু'টি লাল পতাকা
৭ নম্বর বিপদ সংকেত	ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগের ঝড় সরাসরি বন্দর অতিক্রম করতে পারে বা কাছ ঘেঁষে উপকূল ত্যাগ করে।	দু'টি লাল পতাকা
৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত	মহাবিপদ সংকেত শুরু হয় ৮ নম্বর থেকে ঝড়ের বেগ তখন ঘন্টায় ৮৯ কিলোমিটারের বেশি। এ সময় ঝড়টি বন্দরকে বাঁ দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এই মাত্রার ঝড়ে।	তিনটি লাল পতাকা
৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত	এটিও ৮ নম্বরের মতো। দুইয়ের পার্থক্য হলো ঝড় এ সময় উপকূল অতিক্রম করে বন্দরকে ডানে রেখে।	তিনটি লাল পতাকা
১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত	সর্বোচ্চ তীব্র ঝড় যখন সরাসরি বন্দরের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে, তখন ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের ঘোষণা দেন আবহাওয়াবিদগণ। এ সময় ঝড়ের গতিবেগ থাকে ৮৯ কিলোমিটারের বেশি। কিন্তু সরাসরি বন্দর অতিক্রম করে বলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশি হয়।	তিনটি লাল পতাকা
১১ নম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত	সর্বোচ্চ মাত্রার বিপদ সংকেত হলো ১১ নম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত। এ সময় সামুদ্রিক জাহাজগুলোর সাথে আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।	তিনটি লাল পতাকা

অধ্যায় ১৩ - ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের সতর্ক সংকেত

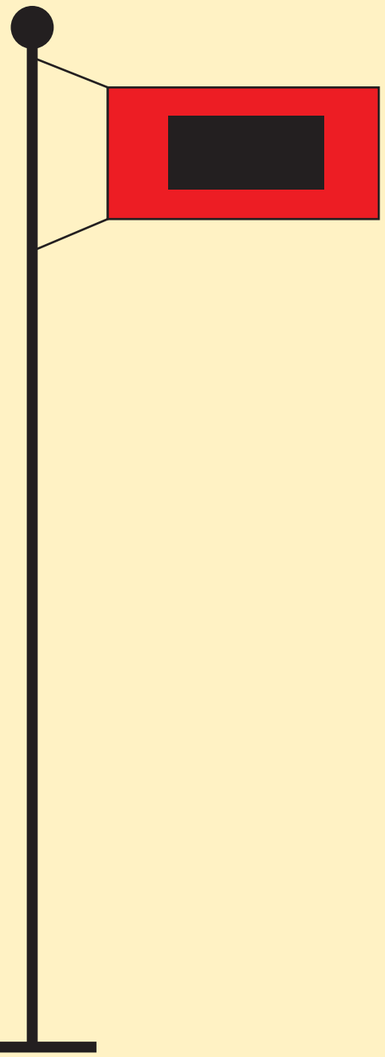

সংকেত নম্বর
১, ২, ৩ এবং ৪
(১টি পতাকা)

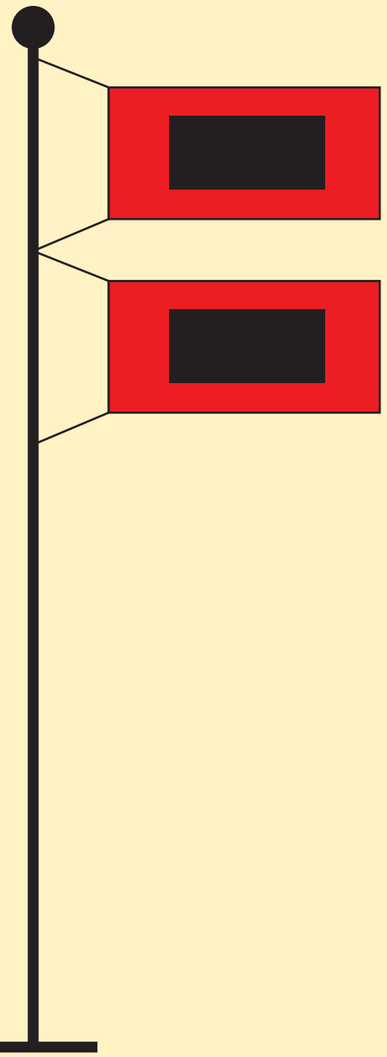

সংকেত নম্বর
৫, ৬ এবং ৭
(২টি পতাকা)

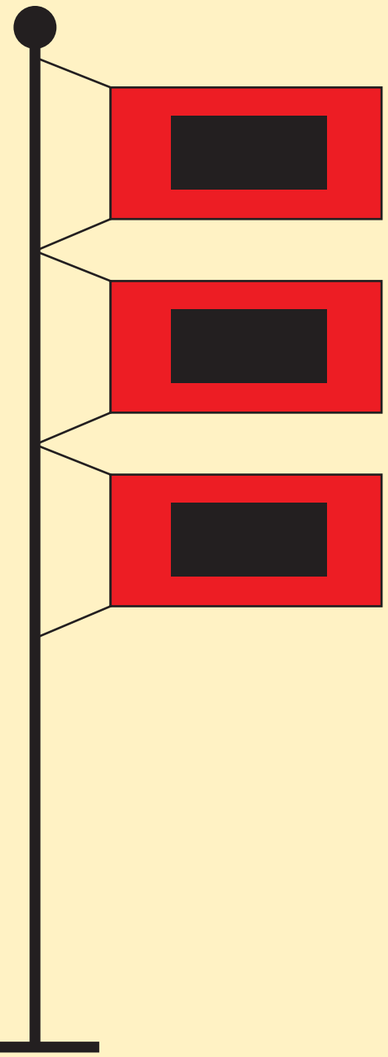

সংকেত নম্বর
৮, ৯ এবং ১০
(৩টি পতাকা)

অধ্যায় ১৪ - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: লবণাক্ততা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বিরাট একটা অংশের মাটি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হচ্ছে যা উপকূলীয় এলাকায় কৃষিতে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী প্রায় ৫৩% অঞ্চল লবণাক্ততা দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত।

লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণ

- বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-ভাগ সমুদ্র সমতল থেকে ১.৫ থেকে ১১.৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ায় সমুদ্রের লবণ পানি জোয়ারের সময় খুব সহজে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মাটিকে লবণাক্ত করে তুলছে।
- জলোচ্ছ্বাস ও উচ্চ জোয়ারের ফলে উপকূলীয় অঞ্চল লবণাক্ত পানিতে প্রায় নিয়মিতভাবে প্লাবিত হয়ে থাকে ফলে লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ে।
- ফারাক্কা বাঁধসহ অন্যান্য বাঁধ ও কালভার্টের বিরূপ প্রভাবে উজান থেকে বয়ে আসা নদীর মিষ্টি পানির স্রোতধারা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ পানির অনুপ্রবেশের মাধ্যমে লবণাক্ততা ছড়িয়ে পরে।
- বাগদা চিংড়ির ব্যাপক চাহিদার ফলে কিছু মানুষ পোল্ডার কেটে লোনাপানি ঢুকিয়ে বাগদা চিংড়ি চাষ করে থাকে ফলে জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়।

লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাব

- লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাওয়ায় ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে, ফলে খাদ্যের সংকট বেড়ে যাচ্ছে।
- মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে মিঠা পানির সব উৎস লবণাক্ত পানিতে পরিণত হয় ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের তীব্র পানীয় জলের অভাব দেখা যায়।
- লবণাক্ত পানি পান করার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। যেমন: উচ্চ রক্তচাপ, খিঁচুনি, কলেরা, অকাল গর্ভপাত, প্রতিবন্ধি সন্তান জন্মদান, অপুষ্টি ইত্যাদি।
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে মানুষের স্থানান্তরের ঘটনা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে।
- লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের প্রাণিবৈচিত্র্য বিপন্ন হচ্ছে।

অধ্যায় ১৪ - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: লবণাক্ততা বৃদ্ধি

অধ্যায় ১৫ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা হলো একটি নিরাপদ, টেকসই ও অভিযোজনযোগ্য আবাসন ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এসব বসতভিটা এমনভাবে নির্মিত হয় যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এবং মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটায় কী কী উপাদান থাকতে পারে?

- বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও জলাবদ্ধতা নিরসনে উঁচু প্ল্যাটফর্মে নির্মিত ঘর ও পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা।
- ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি, বাতাসের গতি সহ্য করতে পারে এমন নির্মাণ সামগ্রী/উপকরণ (আরসিসি কাঠামো) ব্যবহার করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করা।
- নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার (সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা)।
- তাপমাত্রা, ভূমিক্ষয় ও ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি নিয়ন্ত্রনে বসতভিটায় বৃক্ষরোপণ।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা কীভাবে উপকূলীয় এলাকার মানুষের উপকার করে?

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে।
- বন্যা বা অতিবৃষ্টির সময় বন্যার কবল থেকে বসতবাড়ি রক্ষা করে।
- সুপেয় পানির ব্যবস্থ্যা নিশ্চিত করে।
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।
- বিকল্প আলোর উৎস (যেমন: সৌরশক্তি) নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটার পরিচর্যা কিভাবে করা হয়?

- বসতভিটার কোন অংশ ভূমিক্ষয় হলে দ্রুত মেরামত করা ও ঢালে ঘাস লাগানো।
- পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও নালা পরিষ্কার রাখা।
- নিয়মিত ছাদ ও দেওয়াল পরীক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত ও শৈবাল পরিষ্কার করা।
- ছাদের পানি পড়ে বসতভিটার মাটি ক্ষয় না হয় সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কার করা।
- সোলার প্যানেল, ব্যাটারির কার্যকারিতা ও সংযোগ পরীক্ষা করা।
- ঘরের কাঠামো দুর্বল হলে সময়মতো মেরামত ও শক্তিশালী করা, দ্রুত ক্ষয় রোধে লোহা বা ধাতব অংশে অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট ব্যবহার করা।
- পচন রোধে কাঠের অংশে বার্নিশ বা ওয়াটারপ্রুফ কোটিং দেওয়া।
- মাটির উপরে ল্যাট্রিনের পিটের (রিংয়ের) কোন অংশ থাকলে তার চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করা ও মল চুইয়ে বাইরে নির্গত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা।
- বসতভিটার চারপাশে বেশি করে গাছ লাগানো।

অধ্যায় ১৫ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা

অধ্যায় ১৬ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল স্যানিটারি ল্যাট্রিন

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল স্যানিটারি ল্যাট্রিন বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

আমাদের সকলের এমন একটি পায়খানা ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে মলমূত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে আবদ্ধ থাকে এবং ঢাকা থাকে যেন তা কোনভাবে সরাসরি কীটপতঙ্গ, পশুপাখি এবং বাতাস ও পানির সংস্পর্শে না আসতে পারে, বা রোগ জীবাণু ও দুর্গন্ধ না ছড়ায়, এধরণের পায়খানাকেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের ফলে রোগ জীবাণু ছড়ায় না এবং পরিবেশ দূষিত হয় না।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল স্যানিটারি ল্যাট্রিন বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার প্রধান বৈশিষ্ট্য ৭টি

১. রোগ জীবাণু ছড়ায় না।
২. দুর্গন্ধমুক্ত।
৩. মশা-মাছির উপদ্রব মুক্ত।
৪. মল ঢাকা থাকে।
৫. পরিবেশ দূষণ করে না।
৬. বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও জলাবদ্ধতা নিরসনে উঁচু প্ল্যাটফর্মে নির্মিত।
৭. ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি, বাতাসের গতি সহ্য করতে পারে এমন নির্মাণ সামগ্রী / উপকরণ (আরসিসি কাঠামো) ব্যবহার।

স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবস্থাপনা

- সবসময় ল্যাট্রিনের দরজা বন্ধ রাখা।
- ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ব্যবহার করা।
- পায়খানা ব্যবহারের সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করা।
- প্রতিদিন (সম্ভব না হলে সপ্তাহে অন্তত দুইদিন) পায়খানার ভিতর ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে পরিষ্কার করা।
- পায়খানার একটি পিট ভর্তি হয়ে গেলে অন্য পিটে সংযোগ দেওয়া। কিছুদিন (৬ মাস থেকে ১ বছর) পর পূর্বের পিট পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা।
- পায়খানার ভিটি বা গর্তের পাড় কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে পুনরায় মাটি দিয়ে মেরামত করা।
- বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি যাতে পায়খানায় প্রবেশ না করে সে জন্য ব্যবস্থা নেয়া।
- পায়খানার চারপাশে ঝোপঝাড় বা আবর্জনা জমতে না দেয়া।
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, স্থানীয় পরিষেবা প্রতিষ্ঠান বা ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা নেয়া।
- শিশুদের ল্যাট্রিন ব্যবহার শেখানো।

অধ্যায় ১৬ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল স্যানিটারি ল্যাট্রিন

অধ্যায় ১৭ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ হলো একটি পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি বিশেষভাবে তৈরি রিজার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। এই পানি গৃহস্থালি কাজ, কৃষি ও সুপেয় পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি একটি পরিবেশ বান্ধব, সহজ এবং খরচ সাশ্রয়ী পানি সংগ্রহ পদ্ধতি, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় যেখানে বিশেষ করে সুপেয় পানির অভাব রয়েছে সেখানে অত্যন্ত কার্যকর।

বৃষ্টির পানি কীভাবে রিজার্ভার-এ সংরক্ষণ করা যায়?

- বাড়ির টিন/ছাদে পড়া বৃষ্টির পানি পাইপের মাধ্যমে সংরক্ষণাগারে (রিজার্ভার-এ) নেওয়া হয়।
- ছাদে প্রথম ধাক্কায় জমে থাকা ময়লা পানি "ফার্স্ট ফ্লাশ" দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।
- পানি ঢোকার মুখে ছাঁকনি বা জালি বসানো হয় যাতে পাতা, ময়লা বা কীটপতঙ্গ ঢুকতে না পারে।
- প্লাস্টিকের ট্যাংক, কংক্রিটের ট্যাংক বা ইটের চেম্বার - যেকোনো কিছু ব্যবহার করে রিজার্ভার তৈরি করা যায়।
- ঘরের ছাদ অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ধুলাবালি-ময়লা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।
- পাইপগুলো ঢালু করে বসাতে হবে যাতে পানি সহজে প্রবাহিত হয়।

বৃষ্টির পানি রিজার্ভার-এর রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম

- রিজার্ভার-এর ঢাকনা সবসময় বন্ধ রাখা যাতে মশা-মাছি বা ধুলা-বালি প্রবেশ না করে।
- পানি ট্যাংকে ঢোকার আগে ছাদ ও পাইপলাইন পরিষ্কার রাখা, যেন এখান থেকে ময়লা এসে ট্যাংকে জমতে না পারে।
- বৃষ্টির পর প্রথম ৫-১০ মিনিট (ছাদ বা টিনের চাল ধুয়ে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত) বৃষ্টির পানি ট্যাংকে প্রবেশ না করানো।
- বৃষ্টির সময় প্রতি মাসে অন্তত দুইবার ট্যাংকের পাইপ এবং ফিল্টার বা জালি পরিষ্কার করা।
- বছরে অন্তত দুইবার ট্যাংক খালি করে নিচে জমে থাকা, কাদামাটি বা শেওলা পরিষ্কার করা। পরিষ্কারের সময় ব্রাশ ও ব্লিচিংযুক্ত পানি ব্যবহার করা।
- সংরক্ষিত পানির গুণমান নিশ্চিত করতে বছরে অন্তত একবার পানি পরীক্ষা করা।
- পোকামাকড়, দূষণ ও শৈবাল জন্মানো প্রতিরোধে ট্যাংকের ঢাকনা সবসময় এমনভাবে বন্ধ রাখা যাতে আলো, বাতাস ট্যাংকের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।
- ট্যাংকের পাইপে কোথাও লিক বা ব্লক আছে কি না তা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

অধ্যায় ১৭ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলঃ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

অধ্যায় ১৮ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় কাঁকড়া চাষ

কাঁকড়া চাষ ও এর উপকারিতা

- উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে, যেখানে অন্য কোন কিছু চাষাবাদ করা যায় না, সে জায়গা কাঁকড়া চাষের জন্য উপযুক্ত।
- কাঁকড়া দ্রুত বর্ধনশীল, ৪-৫ মাসেই বাজারজাত করা যায়।
- কাঁকড়ার বাজারদর ভালো ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

কাঁকড়া চাষের পদ্ধতি

- লোনা পানির ব্যবহার: চাষের জন্য ৫-১৫ ppt মাত্রার লবণাক্ত পানি দরকার।
- পোনা সংগ্রহ: হ্যাচারি থেকে সংগৃহীত পোনা ব্যবহার করা সুবিধাজনক।
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা: কাঁকড়াকে ছোট মাছ, শামুক, চিংড়ির মাথা বা বিশেষ কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয়।
- মোল্টিং পর্যবেক্ষণ: কাঁকড়া খোলস পাল্টায়; এ সময় যত্ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।
- নিয়মিত পরিদর্শন: পানি পরিষ্কার রাখা এবং পিএইচ, তাপমাত্রা ও অক্সিজেন মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

কাঁকড়ার রোগবালাই ও প্রতিকার

রোগ

- খোলস নরম হয়ে যাওয়া (মোল্টিং সমস্যা)।
- কালো দাগ ও ছত্রাক।
- খাবার গ্রহণ না করা বা দুর্বলতা।
- পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

- পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার।
- মানসম্মত খাদ্য প্রদান।
- ঘের নিয়মিত পরিষ্কার রাখা ও অতিরিক্ত খাবার না দেয়া।
- ক্ষতিগ্রস্ত কাঁকড়াকে আলাদা রাখা।
- প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট থেকে কারিগরি পরামর্শ গ্রহণ করা।

অধ্যায় ১৮ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় কাঁকড়া চাষ

অধ্যায় ১৯ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: উপকূলীয় এলাকায় মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

প্রচলিত পদ্ধতিতে গ্রামের মাঠে, বাগানে, রাস্তার পাশে বেঁধে রেখে বা ছেড়ে দিয়ে ছাগল পালন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন লাভজনক হচ্ছে না। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া দূযোর্গকালীন সময়সহ অন্যান্য সময়ে মাচায় অবস্থান করে বিধায় তাদের মৃত্যুহার, রোগ-ব্যাধি কম হয়। ফলে ছাগলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং খামারি বেশি লাভবান হয়।

মাচায় ছাগল/ভেড়া পালনের সুবিধাসমূহ

- দূযোর্গকালীন সময়ে ছাগল/ভেড়া উঁচু শুকনো স্থানে থাকতে পারে। উঁচু শুকনো স্থানে শীতকালে ঠান্ডা কম লাগে।
- সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া, কৃমি, উকুন, চর্মরোগ কম হয়।
- প্রস্রাব ও গোবর সাথে সাথে নিচে পড়ে যায় ফলে শরীর পরিষ্কার থাকে।
- মাচার ওপর ও নিচ দিয়ে বাতাস চলাচল করে বিধায় মাচা শুকনো থাকে, যা ছাগলের জন্য আরামদায়ক।
- ছাগলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ছাগল/ভেড়ার বাসস্থান নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা

- ছাগল/ভেড়ার ঘরের মেঝে মাটি থেকে অন্ততঃ ১.৫ থেকে ২ ফুট উঁচু করতে হবে এবং ঘরের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট হওয়া সমীচীন।
- ঘরের পরিবেশ ভেজা, স্যাতস্যাতে না হয়ে শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত হতে হবে।
- ঘর তৈরিতে পাকা বাঁশ/সারি কাঠ ব্যবহার করতে হবে যেন ঘরটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকে।
- ঘর নির্মাণের পূর্বে কাঠ সিজনিং করে নিতে হবে এবং ঘর তৈরির পরে বাঁশ/কাঠের অংশে আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে।
- চাল টিনের হলে তার নিচে অবশ্যই চাটাই বা অন্য কিছু দিয়ে তাপ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শীতকালে অথবা বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় বেড়া পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাচায় খড় বা চট বিছিয়ে দিতে হবে।
- প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে ছাগল বের করার পর ছাগলের পায়খানা এবং প্রস্রাব ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে।
- প্রকল্প থেকে প্রদত্ত ছাগলের ঘর ছাগল পালন ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

ছাগলের টিকা প্রদানের সূচি

রোগের নাম	টিকার নাম	ছাগলের বয়স	প্রয়োগের মাত্রা এবং স্থান
পি. পি. আর	পি. পি. আর ভ্যাকসিন	প্রথমবার ৬ মাস বয়সের পর ১ বছর পরপর	১ মি. লি. চামড়ার নিচে
ক্ষুরারোগ	ক্ষুরারোগ ভ্যাকসিন	প্রথমবার ৬ মাস বয়সের পর ১ বছর পরপর	২.৫ মি. লি. চামড়ার নিচে

অধ্যায় ১৯ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: উপকূলীয় এলাকায় মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

অধ্যায় ২০ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলঃ বসতবাড়িতে সবজি চাষ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে শাক-সবজি উৎপাদন ব্যহত হয়ে থাকে। উঁচুকৃত বসতভিটায় এবং বসতবাড়ির আশেপাশের পতিত জমিতে সারা বছরব্যাপী লবণাক্ততা সহনশীল শাক-সবজি উৎপাদন সম্ভব। এতে একদিকে যেমন পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের কাছে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি সহজলভ্য হবে।

উঁচুকৃত বসতভিটায় সবজি চাষ কেন দরকার?

- বসতবাড়ির বাগান পরিবারের সদস্যদের নিকট পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফলমূল সহজলভ্য করে।
- সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি চাষের ফলে শাক-সবজি খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের যোগান নিশ্চিত করে।
- বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা অন্যান্য খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে পারে।
- রাতকানা রোগসহ বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে মা ও শিশু-কিশোরদের রক্ষা করে।
- পতিত জমি সর্বোত্তম ব্যবহার হয়।

সবজী চাষের জন্য বেড তৈরি পদ্ধতি

- পর্যাপ্ত চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও ঢেলামুক্ত করতে হবে।
- চাষের গভীরতা ২৫-৩০ সে.মি. (প্রায় ১ফুট) হওয়া প্রয়োজন।
- জমির আগাছা শেকড়সহ বাছাই করে বেড তৈরি করতে হবে।
- বেড তৈরির সময় জমিতে জৈব সার যেমন - পচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার বেডের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বেডের প্রস্ত ৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য জমির আকারের সাথে মিল রেখে করতে হবে।
- দুই বেডের মধ্যে ১ ফুট ড্রেন রাখতে হবে।

সবজি চাষের জন্য মাদা তৈরি পদ্ধতি

- ১.৫ হাত x ১.৫ হাত x ১.৫ হাত মাপের গর্ত তৈরি করতে হবে।
- গর্তের মাটি তুলে গর্তের পাশে রেখে দিতে হবে এবং ৩ঃ১ অনুপাতে মাটি ও গোবর/কম্পোস্ট সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।
- গর্ত করে মাদা তৈরি করে তার চার দিকে সুন্দর করে বেড়া দিতে হবে।

মৌসুম ভিত্তিক সবজির শ্রেণীবিন্যাস

১. শীতকালীন বা রবি সবজিঃ যে সকল সবজি শীতকালে (অক্টোবর-মার্চ) চাষ করা হয় তাদেরকে শীতকালীন বা রবি সবজি বলা হয়। কপি গোত্রের বিভিন্ন সবজি (বাধাকপি, ওলকপি, শালগম, ফুলকপি), আলু, টমেটো, শিম, বরবটি, লাউ, মুলা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি শীতকালীন সবজি।

২. গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ সবজিঃ যে সকল সবজি গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) চাষ করা হয় সেগুলোকে গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ সবজি বলা হয়। কুমড়া জাতীয় সবজি (চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া), ঢেঁড়স, পুঁইশাক, ডাঁটা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি সবজি গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়।

৩. উভয়-মৌসুমি সবজিঃ বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়স, লালশাক, কলমিশাক, পেঁপে ইত্যাদি উভয় মৌসুমে জন্মানো যায়। যে সকল সবজি বছরের যে কোনো সময় চাষ করা যায় তাদেরকে উভয় মৌসুমি সবজি বলা হয়।

অধ্যায় ২০ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলঃ বসতবাড়িতে সবজি চাষ

অধ্যায় ২১ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: বসতবাড়িতে বনায়ন

বসতবাড়িতে বনায়ন : বসতবাড়িতে বনায়ন হলো বসতবাড়ির আনাচে-কানাচে বনজ ও ফলজ, ছায়াবর্ধনকারী, ঔষধি এবং অন্যান্য বৃক্ষ রোপন। বসতভিটা উঁচুকরণের পর বৃক্ষরোপন করলে একদিকে যেমন বসতভিটা ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে ফল ও কাঠের পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে কিছু অর্থ উপার্জনও সম্ভব হবে।

চারা রোপণের উপযুক্ত সময়

সাধারণত সারা বছর গাছের চারা রোপণ করা গেলেও আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে গাছের চারা রোপণের উত্তম সময়। কারণ বর্ষা মৌসুমে একদিকে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে অপরদিকে মাটিতে রসের পরিমাণও যথেষ্ট থাকে, তা যা রোপিত চারা সতেজ রাখতে সহায়ক। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় বৃক্ষরোপণ করা ঠিক নয়। কারণ এ সময় মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকে এবং গাছের শিকড়ের শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে, ফলে শিকড় পচে যায় এবং চারা মরে যায়।

রোপিত চারার যত্ন

- রোপিত চারাকে অবশ্যই প্রবল বাতাস, শিলাবৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য খুঁটি ব্যবহার করতে হবে। ৫ সে.মি. কাঠের খুঁটি অথবা ২.৫ সে.মি. ব্যাসের স্টিলের খুঁটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থাযুক্ত খাঁচা দিয়ে গাছকে জীব-জন্তুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
- তার জাল বা পাতলা মশারির নেট দিয়ে চারার চারদিক ঘিরে দেয়া উত্তম।

বসত ভিটায় কোথায় কী গাছ রোপণ করতে হয়

- বাড়িতে বৃক্ষ রোপণের সময় দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতির এবং যেসব গাছের ডাল-পালা কম হয় সেগুলো নির্বাচন করতে হবে যাতে খোলামেলা বাতাস সহজেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।
- উত্তর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রকৃতির গাছের চারা এবং পশ্চিম পার্শ্বে মাঝারি আকৃতির গাছ লাগানো উপযোগী।
- বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে পেয়ারা, ডালিম, লেবু, পেঁপে গাছ রোপণ করা যেতে পারে।
- দু-একটা নিম গাছ রোপণ করলে স্বাস্থ্যকর বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়।
- ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গায় বস্তায় আদা ও হলুদের চাষ করা যেতে পারে।
- বাড়ির গেটে কিছু বাহারি গাছ রোপণ করে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।
- বাড়ির ঢালে ধৈঞ্চা বীজ বপন করে মাটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া যায়।
- কলা গাছ রোপণ করে বাড়তি পুষ্টি ও আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। বন্যার সময় কলা গাছের ভেলা বন্যা প্লাবিত বাসিন্দাদের জরুরি বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অধ্যায় ২১ - জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল: বসতবাড়িতে বনায়ন

অধ্যায় ২২ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল: সৌরবিদ্যুৎ

সৌরবিদ্যুৎ কী?

সৌরবিদ্যুৎ হলো সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া। বিশেষ ধরনের সৌর প্যানেল (Solar Panel) সূর্যের আলো শোষণ করে তা বিদ্যুতে রূপান্তর করে, যা ব্যাটারি-তে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়। সৌরবিদ্যুৎ একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী জ্বালানি উৎস।

সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের উপকারিতা

- কোনো ধরণের ধোঁয়া, শব্দ বা কার্বন নির্গমন হয় না।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়ক।
- একবার স্থাপন করলে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।
- মাসিক বিদ্যুৎ বিল নেই।
- বিদ্যুৎ না থাকলেও ঘরে আলো, পাখা, মোবাইল চার্জ চালানো যায়।
- দুর্গম অঞ্চলেও সহজে স্থাপনযোগ্য।
- নিরাপদ আলোর উৎস হিসেবে শিশু ও বয়স্কদের জন্য উপকারী।
- দুর্যোগকালীন সময়ে বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গৃহস্থালী সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় করণীয়

- প্রতি ১-২ মাসে একবার প্যানেল পরিষ্কার করা - যাতে ধুলা জমতে না পারে। প্যানেলে ধুলাবালি, পাখির বিষ্ঠা, শুকনো পাতা জমলে সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যায়।
- প্যানেল থেকে ব্যাটারি, চার্জ কন্ট্রোলার ও ইনভার্টার - এর সংযোগ ঠিক আছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা।
- ব্যাটারির টার্মিনালে মরিচা পড়লে তা পরিষ্কার করে গ্রিজ/ভ্যাসলিন লাগানো।
- প্রতি মাসে ১/২ বার সোলার প্যানেলের ব্যাটারির পানি (ডিস্টিল্ড ওয়াটার) পরীক্ষা করা (লিড এসিড ব্যাটারির জন্য)।
- বৃষ্টি বা ঝড়ের পর প্যানেলে ফাটল বা কোন অংশে পানির প্রবেশ ঘটেছে কি না পরীক্ষা করা।
- বজ্রপাত বা অতিরিক্ত লোডের সময় সংযোগ বন্ধ রাখা।
- যান্ত্রিক ত্রুটি বা সমস্যা হলে প্রশিক্ষিত কারিগর বা সৌরবিদ্যুৎ বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা।

অধ্যায় ২২ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশলঃ সৌরবিদ্যুৎ

অধ্যায় ২৩ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল: পরিবেশবান্ধব চুলা

পরিবেশবান্ধব চুলা কী? পরিবেশবান্ধব বা উন্নত চুলা (Improved Cookstove) হলো এমন এক ধরনের রান্নার চুলা, যা সাধারণ চুলার তুলনায় কম কাঠ বা জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং কম ধোঁয়া সৃষ্টি করে। এটি ঘরের ভেতর বায়ু দূষণ কমায় ও জ্বালানি সাশ্রয় করে। এছাড়া পরিবারে নারী ও শিশুদের শ্বাসকষ্ট জাতীয় রোগ কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিবেশবান্ধব চুলা কীভাবে কাজ করে?

- পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলার ডিজাইন এমনভাবে করা হয়, যাতে তাপ একত্রিত হয়ে সরাসরি হাঁড়ির নিচে গিয়ে পড়ে।
- ভিতরে বায়ু চলাচলের সঠিক ব্যবস্থায় জ্বালানি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।
- অনেক চুলায় ধোঁয়া নির্গমনের জন্য পাইপ বা চিমনি থাকে, যা ধোঁয়া ঘরের বাইরে বের করে দেয়।
- পরিবেশ বান্ধব চুলা ব্যবহারের ফলে জ্বালানি সাশ্রয় হয়, তাপ বেশি পাওয়া যায় এবং ঘরে ধোঁয়া অপেক্ষাকৃত কম জমে।

পরিবেশবান্ধব চুলার উপকারিতা

স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

- ধোঁয়া কম হওয়ায় চোখ, ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা কম হয়।
- নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।

অর্থনৈতিক উপকারিতা

- কম কাঠে রান্না হওয়ায় ব্যয় হ্রাস পায়।
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বারবার তৈরি করতে হয় না।

পরিবেশগত উপকারিতা

- কাঠ ও জ্বালানি সাশ্রয় হয়, ফলে বনাঞ্চল রক্ষা হয়।
- কার্বন নিঃসরণ কমে, ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে সহায়ক।

সামাজিক উপকারিতা

- রান্নার সময় ও কষ্ট কমে।
- রান্নাঘরের পরিবেশ পরিষ্কার ও ধোঁয়ামুক্ত থাকে।

পরিবেশবান্ধব চুলা রক্ষণাবেক্ষণ

- রান্নার পরে চুলার ছাই ও পোড়া কাঠ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- সপ্তাহে অন্তত ১-২ বার সম্পূর্ণভাবে চুলা পরিষ্কার করতে হবে।
- ভেজা কাঠ বা কাঁচা গাছপালা ধোঁয়া বাড়ায়, শুকনো কাঠ ব্যবহার করলে কম ধোঁয়া হবে।
- ধোঁয়া নির্গমনের জন্য চিমনি বা পাইপ ব্যবহার করলে তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে, কেননা ধোঁয়ার পথ বন্ধ হলে চুলার কার্যকারিতা কমে যায়।
- চুলায় ফাটল বা ছিদ্র হলে তা কাদামাটি দিয়ে দ্রুত মেরামত করতে হবে, অল্প অল্প করে জ্বালানি দিলে দহন ভালো হয় এবং চুলা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অধ্যায় ২৩ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশলঃ পরিবেশবান্ধব চুলা

অধ্যায় ২৪ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল: ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার)

ভার্মি কম্পোস্ট কী? ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার হলো একটি জৈব সার, যা কেঁচোর মাধ্যমে গৃহস্থালির জৈব বর্জ্য ও গোবর পচিয়ে তৈরি হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থ না থাকায় এটি মাটির জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং পরিবেশবান্ধব। এটি বর্জ্য থেকে মিথেন উৎপাদন বন্ধে সহায়তা করে ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রশমন কৌশল হিসেবেও কাজ করে।

ভার্মি কম্পোস্টের উপকারিতা

- মাটির উর্বরতা ও গঠন উন্নত করে।
- জমির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ফসলের গুণগত মান ও উৎপাদন বাড়ায়।
- রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমায়।
- মাটির ক্ষতিকর জীবাণু দমন করে উপকারী জীবাণুর পরিমাণ বাড়ায়।
- দীর্ঘমেয়াদে জমিকে স্বাস্থ্যকর ও টেকসই রাখে।
- পরিবেশবান্ধব ও খরচসাশ্রয়ী পদ্ধতি।

ভার্মি কম্পোস্ট প্রস্তুতির ধাপসমূহ

১. **স্থান নির্বাচন:** ছায়াযুক্ত, উঁচু ও পানি জমে না এমন জায়গা নির্বাচন
২. **বিছানা তৈরি:** নারকেলের ছোবড়া বা শুকনো খড় বিছিয়ে তার উপর আধাপচা গোবর ও শাকসবজির খোসা দেয়া।
৩. **কেঁচো ছাড়া:** Eisenia fetida প্রজাতির লাল কেঁচো ছাড়া (প্রতি ঘনফুটে প্রায় ১,০০০টি)।
৪. **আর্দ্রতা:** প্রতিদিন হালকা পানি ছিটিয়ে দেয়া, যেন ভিজে থাকে।
৫. **ঢেকে রাখা:** ছালা, বস্তা বা পুরাতন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা।
৬. **সময়:** ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে কালো রঙের, ঝুরঝুরে, গন্ধহীন সার তৈরি হবে।

ভার্মি কম্পোস্ট কীভাবে ব্যবহার করবেন?

- **বীজতলায়:** ১ বর্গমিটারে ১-২ কেজি কেঁচো সার মিশিয়ে নিন।
- **সবজি বা ফলজ গাছে:** গাছের গোড়ায় প্রতি গাছে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত ব্যবহার করুন।
- **ধান/ফসলের মাঠে:** প্রতি শতকে ৪-৬ কেজি কেঁচো সার মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।
- মাটির উপরে ছিটিয়ে এবং হালকা কোপ দিয়ে মিশিয়ে দিন।
- প্রয়োজনে সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন আগে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অধ্যায় ২৪ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল: ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার)

অধ্যায় ২৫ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার প্রস্তুতকরণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে নানান ধরনের বর্জ্য তৈরি হয়। যেমন রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া খাদ্য, শাকসবজির খোসা, পাতা, গবাদি পশুর গোবর, ছাগলের মাচার বর্জ্য, শুকনো পাতা ইত্যাদি। এদের অনেকটাই জৈব বর্জ্য, যা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায়। এভাবে বর্জ্য থেকে তৈরি জৈব সার পরিবেশবান্ধব, খরচ সাশ্রয়ী এবং টেকসই কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এটি বর্জ্য থেকে মিথেন উৎপাদন বন্ধে সহায়তা করে ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রশমন কৌশল হিসেবেও কাজ করে।

জৈব সার তৈরির ধাপসমূহ

- একটি ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গায় গর্ত তৈরি করুন বা বড় ড্রাম/বালতি ব্যবহার করুন।
- গর্তে বা পাত্রে পর্যায়ক্রমে রান্নাঘরের জৈব বর্জ্য, শাকসবজির খোসা, শুকনো পাতা, গাছের ডাল ও গোবর যুক্ত করুন।
- প্রতিবার বর্জ্য দেওয়ার পরে কিছুটা মাটি ছিটিয়ে দিন।
- মাঝেমধ্যে পানি ছিটিয়ে ভেজা রাখুন, তবে বেশি পানি দেয়া যাবে না।
- প্রতি ৭-১০ দিন পর পর মিশ্রণটি ভালোভাবে উল্টে দিন যেন বাতাস প্রবাহিত হয়।
- ৪৫-৬০ দিন পর দেখতে পাবেন কালচে ও গন্ধহীন গুঁড়া যেটি জৈব সার।

জৈব সারের উপকারিতা

- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- ফসলের গুণমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়।
- পরিবেশ দূষণ রোধ করে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে।
- খরচ কমায়।
- উৎপাদিত সবজির স্বাদ বাড়ায় ও স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ।

অধ্যায় ২৫ - জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার প্রস্তুতকরণ

অধ্যায় ২৬ - মাশরুম চাষ

মাশরুম একটি খাওয়ার উপযোগী ছত্রাক (Fungus), যা আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত পরিবেশে জন্মে। মাশরুম চাষ একটি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় পদ্ধতি। অল্প পুঁজি ও কম জায়গায় এই চাষ শুরু করা যায় বলে এটি নারী ও যুবদের জন্য উপযুক্ত ব্যবসা হতে পারে।

মাশরুমের ব্যবহার

খাদ্য হিসেবে

- ভাজি, ভর্তা, কারি, স্যুপ ইত্যাদির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- নিরামিষভোজীদের জন্য মাংসের বিকল্প।

ঔষধি ব্যবহার

- অনেক ধরনের ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন ওষুধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রপ্তানি ও বাজারজাত

- শুকনো ও প্রক্রিয়াজাত মাশরুম অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় হয়।

মাশরুমের উপকারিতা

- উচ্চ প্রোটিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফাইবার ও ভিটামিনসমৃদ্ধ।
- চর্বি ও কোলেস্টেরল নেই, ডায়াবেটিক ও হৃদরোগীদের জন্য নিরাপদ।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও হজমে সহায়তা করে।
- অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক।
- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির একটি কার্যকর উৎস।

মাশরুম চাষ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- বীজ (Spawn)।
- গম/ধানের খড় বা কাঠের গুঁড়া।
- পলিব্যাগ/বোতল বা ট্রে।
- আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত ঘর।

চাষের ধাপসমূহ

১. খড় বা কাঠের গুঁড়া প্রস্তুত: খড় বা কাঠের গুঁড়া পানি দিয়ে ভিজিয়ে ফুটিয়ে নিন বা গরম পানিতে রাখুন।

২. পলিব্যাগে ভরাট: ঠান্ডা হলে বীজসহ স্তর করে পলিব্যাগে ভরুন।

৩. জায়গা নির্বাচন: ছায়াযুক্ত, বায়ুর চলাচল সুবিধাজনক ঘর নির্বাচন করুন।

৪. আর্দ্রতা বজায় রাখা: দিনে ২-৩ বার পানি ছিটিয়ে আর্দ্র পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

৫. ফলন সংগ্রহ: ১৫-২০ দিনের মধ্যে মাশরুম জন্মে। ধারাবাহিকভাবে ২-৩ সপ্তাহ সংগ্রহ করা যায়।

অধ্যায় ২৬ - মাশরুম চাষ

অধ্যায় ২৭ - জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কী?

- জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বলতে পৃথবীতে বিদ্যমান সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, মাইক্রোঅর্গানিজম এবং এদের পরিবেশগত আন্তঃসম্পর্ককে বোঝায়।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হলো প্রাণ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং জীবের প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।
- এটি পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান এবং মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কেন প্রায়াজন?

- খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষা: উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উৎস থেকে আমরা খাদ্য পাই।
- ঔষধ ও চিকিৎসার উৎস: অনেক রোগের ওষধ উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উৎস থেকে তৈরি হয়।
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা: পরাগায়ন, মাটির উর্বরতা ও বৃষ্টিপাতের চক্র জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করা: জীববৈচিত্র্য বাস্তসংস্থানকে টেকসই রাখে।
- মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ: জীববৈচিত্র্য জীবিকায় সহায়তা করে এবং সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।

কিভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়?

- বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি রক্ষা করা।
- বন্যপ্রাণী হত্যা, পাচার ও অবৈধ শিকার বন্ধ করা।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিহার করা।
- শিল্প ও গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধি।
- জলাভূমি, নদী সংরক্ষণ এবং পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন বন্ধ করা।
- পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচি চালু রাখা।
- স্থানীয় জনগণকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা।
- পরাগায়নকারী পতঙ্গ ও ছোট প্রাণীদের আবাসস্থল রক্ষা করা।

অধ্যায় ২৭ - জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

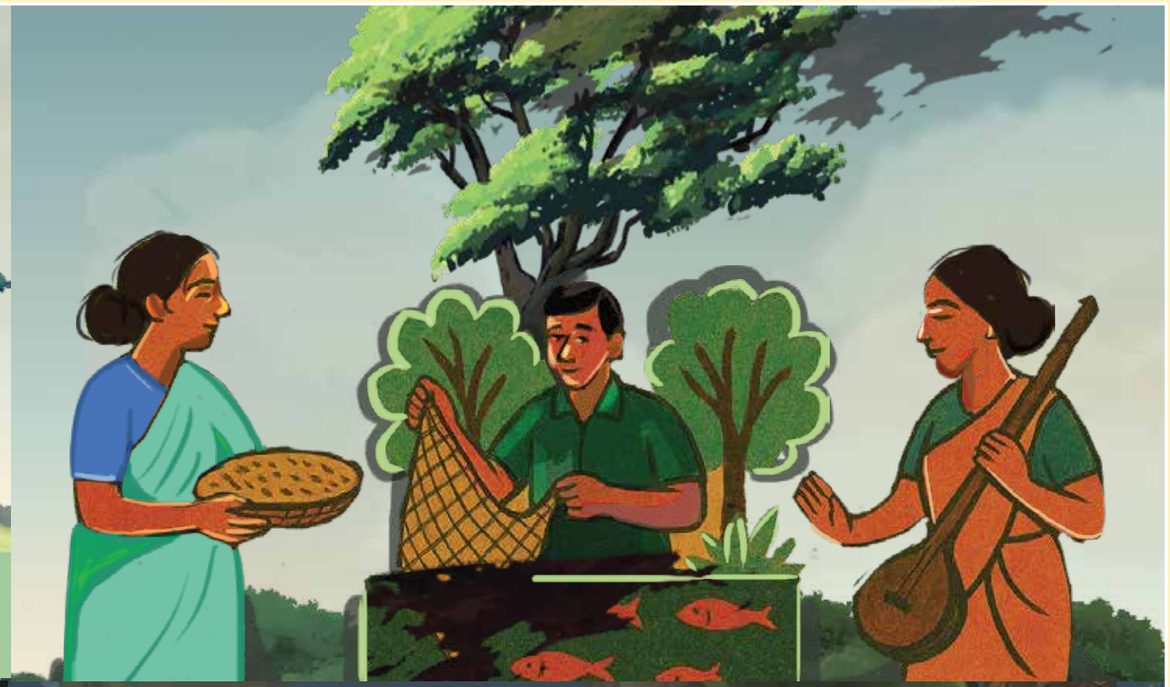

অধ্যায় ২৮ - বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কী?

- ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক।
- এটি শিশুদের মৌলিক অধিকার - যা বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা স্বীকৃত।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' ঘোষণা করে। সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নির্ধারিত শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

কেন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন?

- শিশুর ভবিষ্যৎ বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে। নিরক্ষরতা হ্রাস করে সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনে সহায়তা করে। দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- সামাজিক সাম্য, উন্নয়ন ও স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে করণীয়

- প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা।
- শিশু শিক্ষার অধিকার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করা।
- প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় মানসম্মত বিদ্যালয় স্থাপন।
- শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার বা মিড-ডে মিল, বিনামূল্যে বই, পোশাক ও উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি।
- শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করা।
- বিদ্যালয়ে ফেরা কর্মসূচি চালু রাখা ও ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

অধ্যায় ২৮ - বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

অধ্যায় ২৯ - ব্যবসায়িক পরিকল্পনা

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (Business Plan) হলো একটি লিখিত দলিল বা নকশা, যেখানে একটি ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কৌশল, বাজার বিশ্লেষণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিপণন কৌশল, ঝুঁকি ও সেগুলো মোকাবেলার উপায় ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। কীভাবে একটি ব্যবসা শুরু করা হবে, কী উৎপাদন করা হবে, কোথায় বিক্রি করা হবে, কীভাবে লাভ হবে এবং কে কী দায়িত্ব পালন করবে এসব বিষয় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা।

কেন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রয়োজন?

- সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করে।
- বিনিয়োগকারী বা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে আস্থা দেয়।
- আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার থাকে।
- ব্যবসার ভবিষ্যৎ সফলতা নির্ধারণে সাহায্য করে।

ব্যবসায়িক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ

- কেন ব্যবসা করব?: কাঁকড়া চাষ, ছাগল পালন বা সবজি চাষ করে আয় বাড়াতে চাই।
- কি চাষ করব?: কাঁকড়া, ছাগল বা বিভিন্ন মৌসুমি সবজি চাষ করব।
- কার কাছে বিক্রি করব?: হাটে, বাজারে বা যারা কিনে বিক্রয় বা রপ্তানি করে তাদের কাছে বিক্রি করব।
- কত টাকা লাগবে?: খামার বানানো, খাবার, ওষধ বা চাষের জিনিস কেনায় কত খরচ হবে সেটা ঠিক করব।
- কি পরিমাণ আয় হতে পারে?: কাঁকড়া বা সবজি বিক্রি করে কত টাকা লাভ হতে পারে তা আন্দাজ করব।
- কিভাবে বিক্রি করব?: নিজেরা হাটে নেব, অর্ডার নেব বা পরিচিত দোকানদারদের কাছে বিক্রি করব।
- কে কি কাজ করবে?: দলের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেব, কেউ দেখাশোনা করবে, কেউ বিক্রি করবে।
- কি সমস্যা হতে পারে?: রোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাজারে দাম কমে গেলে কি করব সেটা ভাবব।
- টাকা জমাবো কিভাবে?: লাভের কিছু টাকা জমাবো আর নিয়মিত আয়-ব্যয় লিখে রাখব।

অধ্যায় ২৯ - ব্যবসায়িক পরিকল্পনা

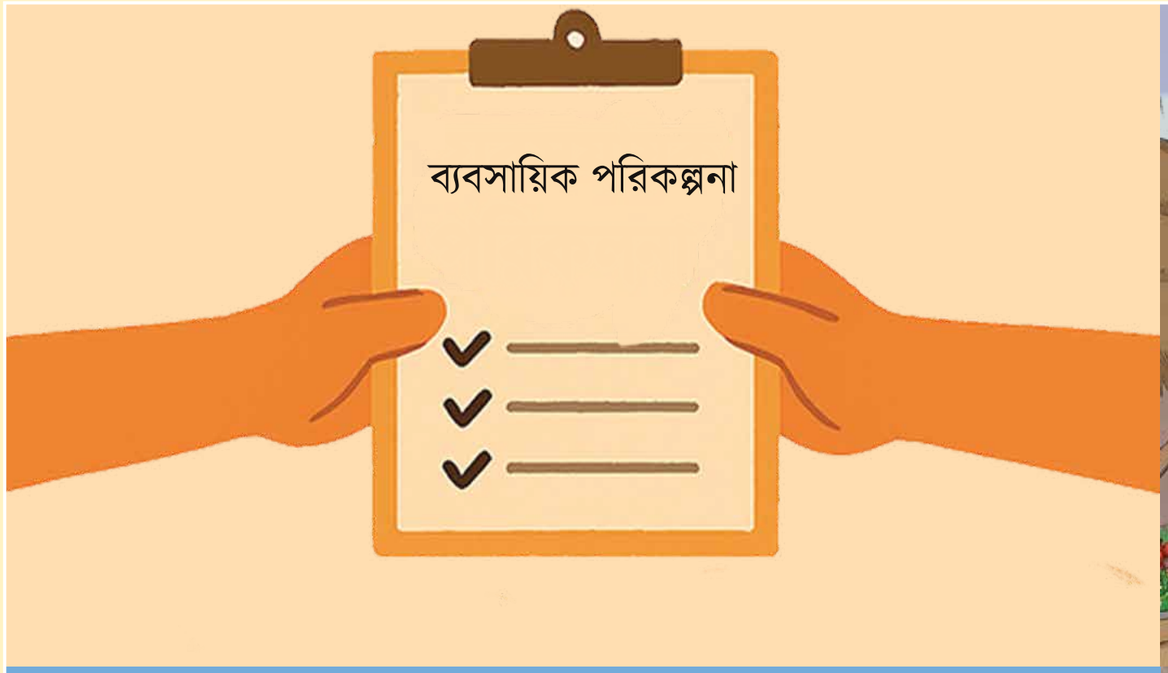

অধ্যায় ৩০ - অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM)

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM) কি?

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি/প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) হলো একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যা পিকেএসএফ, RHL প্রকল্পের সদস্য, প্রকল্প কর্মকর্তাদের মধ্যে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি/প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM)-এর মাধ্যমে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পণ্য, কাজের মান, পরিষেবা, অধিকার, হয়রানিমূলক কার্যক্রম অথবা বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং তাদের কর্মীদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি রিপোর্ট করতে পারে।

কিভাবে অভিযোগ দাখিল করতে হবে?

অভিযোগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ প্রদান করতে চাইলে অভিযোগ গ্রহণ ফরমে লিখিত আকারে সিল করা খামের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার অফিসে অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্ট্রারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাবে এবং এন্ট্রি রেফারেন্সসহ একটি রসিদ সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য, অভিযোগকারী ব্যক্তি যদি লিখিত আকারে অভিযোগ দাখিল করতে অক্ষম হন, সেক্ষত্রে অভিযোগকারী সংস্থার যে কোনো কর্মকর্তা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও অভিযোগকারী স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও অন্য কোন মাধ্যমে যেমনঃ মৌখিক, মোবাইল, ইমেইল, অভিযোগ বক্স বা অন্যান্য মাধ্যমে অভিযোগ প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার GR ফোকাল সঠিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করবেন এবং অভিযোগের যথাযথ নথি বজায় রাখার স্বার্থে অভিযোগ ফরম ও রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করাবেন।

অভিযোগ দাখিল করার পর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি হবে?

- অভিযোগ যথাযথ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উন্মুক্ত সভায়, নির্বাচিত/বাস্তবায়নকারী সংস্থা অভিযোগগুলি শুনতে এবং আলোচনা করতে এবং সমাধান করতে স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার (LGR) ফোকাল পয়েন্টকে সহায়তা করবে। অভিযোগকারী ব্যক্তি, যদি নারী হন, তাহলে জলবায়ু অভিযোজন দলের একজন নারী সদস্য তাকে শুনানিতে সহায়তা করবেন, এবং যদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের হন, তাহলে একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রতিনিধি তাকে সহায়তা করবেন।
- প্রদানকৃত সমাধানে যদি অভিযোগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সন্তুষ্ট না হয়, সেক্ষত্রে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক গৃহীত কোনও সিদ্ধান্ত যদি অভিযোগকারী ব্যক্তিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্প সমন্বয়কারী বা কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ফোকাল পয়েন্টের কাছে অভিযোগগুলো প্রেরণ করবেন।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত অমীমাংসিত অভিযোগগুলো পিকেএসএফ-এর কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ফোকাল পয়েন্ট কার্যালয়ে নিবন্ধিত হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- অভিযোগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বাস্তবায়নকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সরাসরি ফোকাল পয়েন্টের নিকট, পিকেএসএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর নিকট অথবা পিকেএসএফ-এর সাথে সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকলে সরাসরি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

অধ্যায় ৩০ - অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM)

অধ্যায় ৩১ - উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সেবাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও দপ্তরের মাধ্যমে নাগরিকদের নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। যেমন:

১. **উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর:** উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। তাঁর দপ্তর থেকে ভূমি সংক্রান্ত কাজ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তদারকি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণমূলক কাজ, এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিচালিত হয়।

২. **ভূমি অফিস:** উপজেলা ভূমি অফিস থেকে খতিয়ান, নামজারি, জমি মাপজোক এবং খাজনা প্রদান সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

৩. **কৃষি অফিস:** উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ, সার ও বীজ বিতরণ, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকেন।

৪. **স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ:** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাধারণ চিকিৎসা, টিকা কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মাতৃসেবা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে জটিল রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ এখানে করা হয়।

৫. **শিক্ষা অফিস:** উপজেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, উপবৃত্তি বিতরণ, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়।

৬. **সমাজসেবা অধিদপ্তর:** গরীব, অসহায়, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের জন্য ভাতা প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হয়।

৭. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:** বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ নানা ধরণের কর্মসংস্থানমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

৮. **প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য অফিস:** গবাদিপশু ও মাছ চাষিদের পরামর্শ, টিকা প্রদান, খামার উন্নয়নে সহায়তা, মাছের পোনা ও পশু খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি সেবা দেওয়া হয়।

৯. **মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর:** নারী উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনি ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১০. **ডিজিটাল সেন্টার/ইউনিক সেবা কেন্দ্র:** ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে জন্মনিবন্ধন, নাগরিক সনদ, সরকারি চাকরির আবেদন, মোবাইল ব্যাংকিং, টেলিমেডিসিন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।

অধ্যায় ৩১ - উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সেবাসমূহ

পিকেএসএফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

ফোন: ৮৮০-২-২২২২১৮৩৩১-৩৩, ২২২২১৮৩৩৫-৩৯, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-২২২২১৮৩৪১, ২২২২১৮৩৪৩

ই-মেইল: pksf@pksf.org.bd, ওয়েবসাইট: www.pksf.org.bd

www.facebook.com/PKSF.org